কুমু'র অথবা কুমুদিনীদের কথা

অমৃতা ভট্টাচার্য

সাহিত্য সমালোচকরা বরাবরই 'যোগাযোগ'কে (১৯২৯) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষত এই উপন্যাসের সাতান্ন পরিচ্ছেদে কুমুর উক্তি— ('মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?') পাঠক, সমালোচক সকলকেই আলোড়িত করে। কুমুর মধ্যে নারীমুক্তি আন্দোলনের বীজও প্রত্যক্ষ করেন অনেকেই। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে দাম্পত্য সম্পর্কের বিচিত্র বুনন চোখে পড়ে। তার মধ্যে 'যোগাযোগ' আধুনিক মনের বাহক, —এমন একটা মত চলতি আছে। এমন কি কোনো কোনো সমালোচক এ' কথাও লিখেছেন যে, '...''নৌকাডুবি'' তে ব্যক্ত ধারণার সংশোধন ঘটল ''যোগাযোগ'' -এ এসে।'[১] বাস্তবিক বিষয়টা সংশোধনের নয়। দুটি উপন্যাসের সমস্যাপট ভিন্ন। এমন কি চিত্রাঙ্গদা, মৃণাল এবং কুমুদিনীকে যাঁরা এক আসনে বসান তাঁরা হয়ত ভুলে যান যে, এদের প্রত্যেকের সমস্যার একটা নিজস্ব অবয়ব আছে। এরা প্রত্যেকেই স্বভাবগত ভাবে বিচ্ছিন্ন। এদের type বলা যায় না, এর individual, এদের শ্রেণিচরিত্র হিসাবে বিশ্লেষণ করা যায় না।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুদিনীর বিবর্তন চোখে পড়ে। কুমুর অহংবোধের উপলব্ধিকে গল্পে পরিণতি বলা যেতে পারে কিন্তু কখনোই তা গল্পে ভরকেন্দ্র নয়। গল্পের নায়িকা কুমুদিনী হলেও ভাবের বার্তাবাহক বিপ্রদাস। একটা বিশেষ কাল, কিছু নির্বাচিত সংকট এবং কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন —এই মিলেই উপন্যাসটির প্রতিবেশ। 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি (১৯০৬) বা 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) কোনোটির সঙ্গেই এর সাদৃশ্যের পাল্লায় ওজন চলে না।

বিশ শতকের প্রায় শুরু থেকেই বঙ্গদেশের পরিবার পরিকল্পনায় নানা পালাবদল আসতে শুরু করেছে। পারিবারিক গঠন সংক্রান্ত মূল্যবোধগুলিও ক্রমশ তাদের চেহারা পাল্টাচ্ছিল। এর পাশাপাশি দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠে আসছিল। 'যোগাযোগ' তেমনই একটা প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এল। বিপ্রদাস, কুমুদিনী এবং মধুসূদন এর মুখ্য নট-নটী। অন্যান্যরা কিছুটা সঞ্চারী ভাবের মতো, মূল রসকে শমে পৌঁছে দেয়। আপাতভাবে কুমুদিনী এবং মধুসূদনের যে টানাপোড়েন তার সমস্যাপট ভিত্তিহীন। অর্থাৎ, যদি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করা হত তবে কুমুদিনী তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনত? এত আপাত সমস্যাহীন যে দাম্পত্য তারও অসুখ যে কত গভীর হতে পারে তার ছবি দেখি মধুসূদন-কুমুদিনীর সম্পর্কে। রুচি, মনন, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে তাদের ফারাক বিস্তর। কুমুদিনীর আচরণ কিছুটা ব্রাহ্মসুলভ হলেও তার অন্তরে একটা সংস্কারাচ্ছন্ন মন আছে। তার সঙ্গে মিশেছে সাহিত্যবোধ, যুক্তিবোধ। এই দুইয়ের টানাপোড়েনেই কুমুদিনীর ফুটে ওঠা।

উপন্যাসের শুরুতেই লেখক খুব সংক্ষেপে কুমুর মা-বাবার যে ছবি এঁকেছেন সেখানেও ঘর ছাড়ার প্রসঙ্গ আছে। লেখক প্রসঙ্গটি সচেতন ভাবেই এনেছেন। স্বামীর উপর অভিমান করে যে ঘর ছাড়ল তাকে ফিরতে হল অনুশোচনার পথে, দুঃখের মধ্য দিয়ে। অথচ পুরুষটির সেই দায়বদ্ধতা নেই। গল্পের শুরুতেই এই সিদ্ধান্ত যেন কিছুটা চাপিয়ে দেওয়া হয়। একটা পরম্পরা গড়ে তোলার প্রয়াস নজর এড়ায় না। কুমুদিনী এই ভাবনাতেই লালিত। 'বড়োবউ' শব্দটা তাই তার উপর মন্ত্রের মতো কাজ করে। স্বামী তার কাছে একটা আইডিয়াল।

'নৌকাডুবি'তে দেখেছিলাম দুটি নারী-পুরুষকে। তারা দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকল, মানসিক ভাবে মিশল অথচ সম্পর্ক মিথ্যে প্রতিপন্ন হল— সামাজিক সমর্থনের অভাবে। কুমুদিনীও এই স্বেচ্ছায় ঠুলিপরা সমাজেরই একজন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী'র সঙ্গে কথোপকথনে। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন— 'তুমি আমার কুমুকে হিঁদুটি করতে চাও?'[২] বাস্তবিক কুমু তো একাংশে তা-ই। সেই বোধ থেকেই সে মধুসূদনকে ভালোবাসতে চেয়েছে। দাম্পত্যের সংজ্ঞা খুঁজতে পার্বতী-পরমেশ্বরের উপমা টেনেছে। রজনী'র মনুমেন্টকে বিয়ে করার মতোই কুমুদিনীও চোখে দেখার আগেই মধুসূদনের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে। মনের এই দিকটার পাশাপাশি আরেকটা দিক তার আছে। সেটা বইপড়া রোমান্সের কল্পলতায় ঘেরা। রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নায়িকাই অবলীলায় সংস্কৃত কাব্যের উপমা টেনে জীবনকে মাপতে চায়নি। বিপ্রদাসের কাছে সে সংস্কৃত কাব্য পড়েছে। পারসি শেখার ইচ্ছেও তার ছিল। উনিশ শতকে নারী-পুরুষের পাঠ্যের যে বিধিনিষেধ তা কুমুকে স্পর্শ করেনি। মনে পড়বে উনিশ শতকের সমাজ বাস্তবতা নিয়ে লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাসে গঙ্গাপ্রসাদ এবং বিন্দুবাসিনী একসঙ্গে সব বই বড়ার অনুমতি পাচ্ছে না। বিপ্রদাসের স্নেহচ্ছায়াতেই সংস্কৃত কাব্যের একটা প্রেমতন্ময়তার ছবি কুমুর মনে আঁকা ছিল। বাস্তবে তার গরমিল তাকে প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ করেছে। কুমুর দ্বন্দ্বের মূল এখানেই।

উপন্যাসটির মুখ্য চরিত্ররা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ধারণার মুখপাত্র। বিপ্রদাস অবিবাহিত। তার দাম্পত্য অভিজ্ঞতার মূলে সাহিত্যচর্চা। কুমু তার দাদার চোখ দিয়েই জীবনকে বুঝতে চেয়েছিল। যদিও কুমু এবং বিপ্রদাসের মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। 'বিপ্রদাস ভালো করেই জানে এই জায়গাতেই ভাইবোনের মধ্যে অসীম প্রভেদ। কুমুর চিত্তের এই অন্ধকার মহলে ওর উপর দাদার একটুও দখল নেই।' সে অর্থে বিপ্রদাস অনেক বেশি আধুনিক। কুমু তার বোন কিন্তু যদি সেই ভাইয়ের মতো তার বাড়িতেও থকে তাতেও বিপ্রদাসের আপত্তি নেই। তার (বিপ্রদাসের) উক্তিতে মাঝে-মধ্যেই আমরা একটা তৃতীয় স্বর শুনি। লেখক বিপ্রদাসের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেন 'আমি দেখতে

পাচ্ছি মেয়েদের যে আপমান, সে আছে সমস্ত সমাজে ভিতরে, সে কোনো একজন মেয়ের নয়।' বিপ্রদাসের এই কথারই যেন কিছুটা পুরাবৃত্তি শুনি রবীন্দ্রনাথের মুখে— 'আমাদের দেশে ডিভোস' প্রথা নেই বলিয়া যে বিবাহের একীকরণতা বিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। যে দেশে শাস্ত্র ও রামনিয়মে একাধিক বিবাহ হইতে পারে না সেখানে ডিভোর্স প্রথা দূষণীয় বলা যায় না। স্ত্রী অসতী হইলে আমরা ইচ্ছামত তাহাকে ত্যাগ করিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারি। স্বামী ব্যভিচার পরায়ণ হইলেও স্বামীকে ত্যাগ করা স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। স্বামী যখন প্রকাশ্যভাবে অন্য স্ত্রী বা বারনারীতে আসক্ত হইয়া পবিত্র একীকরণের মস্তকে উপর পঙ্কিল পাদুকাসমেতই দুই চরণ উত্থাপণ করেন তখন অরণ্যে রোদন ছাড়া স্ত্রীর আর কোনো অধিকার দেওয়া হয় নাই।'[৩]...

'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশের মতোই 'যোগাযোগ' এ বিপ্রদাস যেন রবীন্দ্রচিন্তার বাহক হয়ে উঠেছে। এরই বিপ্রতীপে আছে মধুসূদন। বয়সের দিকে তাদের ফারাক সামান্যই, চরিত্রগত বৈপরীত্য প্রবল। উনিশ শতকের অথবা বণিক সম্প্রদায়ের 'ভদ্রলোক' হয়ে ওঠার যে প্রবণতা, মধূসূদনও সেই স্বপ্নেই লালিত। গল্পের শুরুতেই দেখি— বাবার মৃত্যুর পর মধুসূদন পণ করে বসল সে রোজগার করবে। 'মা কেঁদে মরে— বড়ো তার আশা ছিল, পরীক্ষা পাসের রাস্তা দিয়ে ছেলে ঢুকবে ''ভদ্দোর'' শ্রেণীর ব্যূহের মধ্যে।' পরীক্ষার পথ না ধরলেও মধুসূদন সমাজের বিশিষ্ট অর্থপতিদের একজন। বিয়ের আগে, এতগুলো বছর হিসেবের খাতাই ছিল তার সঙ্গিনী। সে চোখকান বুজে অর্থ উপার্জন করেছে। মেয়েদের দেখেছে অন্যভাবে। সে জানত 'তার ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে, কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও করে থাকে। মধুসূদনের জীবনে এদের সংস্রব নিতান্তই যৎসামান্য। ওর স্ত্রী ও জগতের এই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলি জীবনযাত্রা অতিবাহিত করবে এর বেশি সে কিছুই ভাবেনি।' স্ত্রী তার কাছে অনেকটা টাকা উপার্জনের মতোই বিষয়। একবার হস্তগত হলেই যার অধিকারী হওয়া সম্ভব। তার মধ্যে যে হারাবারও একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে সে কথা মধুসূদন কোনোদিন বোঝেনি, তাই ভাবেওনি। কুমুদিনী যেন তার লাভক্ষতির জগতের একজন হয়েই দেখা দিল। কুমু যে তার চেনা মেয়েদের থেকে আলাদা তা মধূসূদন উপলব্ধি করেনি। উপন্যাসের তেইশ পরিচ্ছেদে মোতির মার বয়ানে কুমুর একটি চমৎকার বিশ্লেষণ ফুটে ওঠে। মোতির মা '...ভাবতে লাগল, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমরা তো কচি খুকি ছিলুম, মন বলে একটা বালাই ছিল না। ছোটোছেলে কাঁচা ফলটাকে যেমন টপ করে বিনা আয়োজনে মুখে পুরে দেয়, স্বামীর সংসার তেমনি করেই বিনা বিচারে আমাদের গিলেছে কোথাও কিছু বাধে নি। সাধন করে আমাদের নিতে হয়নি, আমাদের জন্য দিন - গোনা ছিল অনাবশ্যক।' এই প্রসঙ্গটি অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে 'মধ্যবর্তিনী গল্পে। নিবারণ আর হরসুন্দরীর দাম্পত্যের একটা অভ্যাস ছিল, প্রেম ছিল না। আসলে তারা তাদের সম্পর্ককে সে ভাবে বোঝার অবকাশও পায়নি। কিন্তু কুমু সেই বালিকাটি নয়। মধুসূদন কুমুকে পেতে চায় কিন্তু পাওয়ার পথটা তার অচেনা। প্রতিদিন নতুন নতুন পরিকল্পনায় সে ভাব জমাতে চেষ্টা করে। তার ভাষা কুমুকে ছুঁতে পারে না।

সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে মধুসূদনের প্রতিনায়কোচিত ছবি ফুটে উঠেছে। যদিও তারও একটা ব্যথা আছে, কুমুকে না পাওয়ার অভাববোধ তাকে কষ্ট দেয়। এই সুযোগটাকেই ব্যবহার করতে চায় শ্যামাসুন্দরী, বিয়ের আগে মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার কোনো শারীরিক বা মানসিক সম্পর্ক ছিল না। কুমুকে অধিকার করতে না পাবার ক্ষোভ একটা শূন্যতা এবং আক্রোশ তৈরি করেছে। এই অভাবের স্বাদ মধুসূদন আগে কখনো পায়নি। ঘোষাল বাড়ির আশ্রিতদের মধ্যে শ্যামা তার জায়গাটাই আরো শক্ত করতে চেয়েছে। কেননা— নবীন, মোতির মা, শ্যামা এর প্রত্যেকেই মধুসূদনের ঘনিষ্ট হলেও আশ্রিত বৈ নয়। অন্তত মধুসূদন তেমনটাই মনে করে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের 'সরীসৃপ' গল্পেও বনমালীর নেকনজরে পড়তে চেয়েছিল দুই বোন। লড়াইয়ে পরী এগিয়ে গেল। তার বয়স অল্প, চারু বিগত যৌবনা। লক্ষ করার বিষয় শ্যামাসুন্দরী এবং মধুসূদনের মধ্যে কোনো প্রেম গড়ে উঠছে না। মোতির মা'র চোখ দিয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় তাদের যে ঘনিষ্ঠতার ছবি আমরা দেখি সেখানে শরীর থাকলেও মন নেই। 'শ্যামা সম্বন্ধে ও কল্পনায় রঙ লাগেনি, অথচ খুব মোটা রকমের একটা আসক্তি জন্মেছে। যেমন শীতকালের বহু ব্যবহৃত ময়লা রেজাইটার মতো, তাতে কারুকাজের সম্পূর্ণ অভাব, বিশেষ যত্ন করবার জিনিস নয়, খাটি থেকে ধুলোয় পড়ে গেলেও আসে যায় না। কিন্তু ওতে আমার আছে।' অর্থাৎ সম্পর্কটা শরীরকে আরাম দেয়। কুমু প্রতিনিয়ত মধুসূদনের যে আত্মমর্যাদাকে খর্ব করছিল শ্যামা তাকেই তৃপ্তি দেয়।

উপন্যাসটি জুড়ে কুমুর বিবর্তন আছে। বিয়ের আগে, বিয়ের পরে এবং সন্তানসম্ভবা কুমু— এই প্রত্যেকটি পর্বে তার চেতনার পালাবদল চোখে পড়ার মতো। এই পালাবদলের ইতিহাসটিই উপন্যাসের প্রাণ। বিয়ের আগে কুমুদিনী যে মধুসূদনকে ভালোবেসেছিল সে ছিল স্বপ্নের মতো। একলা বসে কুমু যখন 'রোমে রোমে হরখীলা' গানটি গায় তখন যেন তার যৌবনকুসুমই ফুটে ওঠে। তার সুবাসে সে নিজেই আমোদিত। অথচ বিয়ের প্রথমদিন থেকেই যেন সম্পর্কের সুরটা ঠিক মতো বাজল না। একটা আপসোস স্পষ্ট হয়ে উঠল। যে কাজটা হয়ে গেছে, যেটা আর ফেরানো যাবে না— তারজন্যই এই আপসোস। কুমুর বেড়ে ওঠা, তার পারিপার্শ্ব সমস্তই স্বতন্ত্র। যেটা মিলনের পথে একটা বড় সংকট কিন্তু তাদের সমস্যার মূল আরো গভীরে প্রোথিত।

বিবাহ সম্পর্কে কুমুর মনে যেন একটা আর্কেটাইপাল ইমেজ নিহিত ছিল। সে জানত, বিবাহ একটা অন্য

জগতের সাক্ষ্য বহন করে। সেখানে চিরপুরুষ ও চিরনারী বাক্য ও অর্থের মতো এক হয়ে যায়। এই এক হওয়া তাদের আর হল না। মধুসূদন সন্তানের পথকেই তাদের মিলনের একমাত্র উপায় বলে ঠাউরেছে। অর্থাৎ কুমুকে যদি তার সন্তানের বাঁধনে বাঁধা যায় তবে তার আর পালানোর কোনো পথ থাকবে না। পাঠক জানে তাদের শরীর মিললেও মন মেলেনি। বিপ্রদাসও এ'কথা বুঝেছিল কিন্তু সন্তানসম্ভবা কুমুকে কোনো দ্বিতীয় পথের হদিশ সে দিতে পারেনি।

বিশ শতকের শুরু থেকেই সাহিত্যভিত্তিক সমাজচর্চায় নরনারীর মিলনের প্রসঙ্গে একটা অতিরিক্ত সত্তা গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে—সেটি মন। ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌন সম্পর্কের মর্মান্তিক পরিণতি দেখি জগদীশ গুপ্তের 'চন্দ্র-সূর্য যতদিন' গল্পে। মনে পড়বে, কোনো এক রাতে মধুসূদন আর ঘরে আসবে না ভেবে কুমু নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। মধুসূদনের আকস্মিক আহ্বানে সে শুধু অবাকই হয় না, সংকুচিতও হয়। এই সামান্য ইঙ্গিতেই ঔপন্যাসিক তাদের শয্যাযাপনের সুরটি বোঝাতে চেয়েছেন। 'যোগাযোগ' এর আরো অনেক পরে লেখা সুবোধ ঘোষের 'বৈদেহী' গল্পেও এমনই এক রূপরেখা চোখে পড়ে। যদিও সেক্ষেত্রে মূল সমস্যার টান পৃথক তবু মনবিহীন শরীরী সম্পর্ক মল্লিকাকে ক্লান্ত করে। অবশেষে সন্তানভারে ন্যুব্জ স্ত্রীকে ফেলে স্বামী টেলিফোনে অন্ধকারের দাম জেনে নেয়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় মল্লিকা এসে দাঁড়ায়। বলে— 'বাধা দিতে আসিনি, শুধু বলতে এসেছি, এভাবে যেতে নেই।

বিকাশ— কিভাবে যেতে নেই:

মল্লিকা — যেভাবে যাচ্ছ।

বিকাশ বিব্রতভাবে তাকায়। হেসে ফেলে মল্লিকা। —একটু সেজে যেতে হয়। কথাগুলি একটা অর্থহীন বাজে ঠাট্টার মতই, কিন্তু শুনে আশ্চর্য হয় বিকাশ। কথা বলতে গিয়ে ছলছল করে উঠেছে মল্লিকার গলার স্বর। —একটু সাজিয়ে নিতেও হয়। ...বাগানের ঝাউগুলির মাথার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে মল্লিকার চোখ। আর, যেন স্বপ্নের মধ্যে বিড়বিড় করে বলতে থাকে— মুখের দিকে তাকাতে হয়, একটু হাসতে হয় আর আলো নেবাতে হয় না।

যেন একটা সেতারের তার মধুর প্রলাপ বাজিয়ে রাত্রির নীরবতার গুমোট ভেঙে দিচ্ছে। আর শুনতে গিয়ে বিকাশের অতিশিক্ষিত মনের ভিতর ভেঙে যাচ্ছে তিন বছরের একটা মূর্খ বধিরতার গুমোট'।

নারী-পুরুষের শরীরী সম্পর্কের মধ্যে মনের উপস্থিতিকেই নানা ভাবে বুঝতে চাইছেন বিশ শতকের সাহিত্যিকরা। অন্যদিকে, মিলনের ফলে যে সন্তান আসছে সে আদৌ কাম্য কি না, মেয়েটি তখনও প্রস্তুত কি না তা নিয়ে এই সমাজের কোনো মাথাব্যথা নেই। 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও এই প্রশ্নটি কখনো প্রশ্ন বলে গ্রাহ্য হয়নি। বরঞ্চ সমগ্র উপন্যাসে যে জটিলতা ক্রমশ গভীরতর হচ্ছিল তা যেন কুমুর সন্তান ধারণে এক সহজ পরিণামে পথ পায়।

ভারতবর্ষে গর্ভপাত আইনসিদ্ধ হয় ১৯৭২ সালে। Single Parent Act এরও অনেক পরে। ফলত, সে পথে হাঁটার উপায় নেই। অবশ্য ১৯৭২ -এর বদলে গর্ভপাত আইন যদি ১৯২৯ -এর হত তা হলেও কুমু সে পথে যেত না বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ যদিও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেছিলেন যে, কুমু থাকার জন্য যাচ্ছে না, সে ফিরে আসবে এবং একথা জানা যায় যে নাটকের পরিণতি তাঁর পছন্দ হয়নি। উপন্যাসের open ending হয়ত রবীন্দ্রভাবনাকেই সমর্থন করে কিন্তু এ প্রসঙ্গে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মতটিও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন— ...'অপরাজিতা ফুল দিয়ে যে কুমুদিনী স্বামী কামনা করে, সেই চিরকেলে সতীকে বিদ্রোহী করবেন কী করে?' কুমু 'সস্তার বিদ্রোহিনী' নয় ঠিকই তবে যে ঘোষালবাড়িতে সে ফিরে গেল সেখান থেকে বেরোনোর পথ সম্ভবত অত সহজ নয়। এই অনির্দেশ্য তর্কে না মেতে বরঞ্চ সাহিত্য সূত্রেই একটা উত্তর আমরা খুঁজে নিতে পারি।

'যোগাযোগ' নাটকের তৃতীয় অঙ্গে (তৃতীয় দৃশ্য) ফুট্‌কির মুখে একটি গান আছে। তার প্রসঙ্গ অন্য কিন্তু গানটির ভাষা ব্যঞ্জনাবাহী—

'ফিরে আমায় মিছে ডাক', স্বামী।
সময় হল, বিদায় লব আমি।।
অপমানে যার সাজায় চিতা
সে যে বাহির হয়ে এল অগ্নিজিতা,
রাজাসনের কঠিন অসম্মানে
ধরা দিবে না সে যে মুক্তিকামী।।...
তুমি থাকো সোনার সীতার অনুগামী।'

কুমু শেষপর্যন্ত মুক্তি পেল কি না সেটা জানার উপায় নেই কিন্তু বড় কথা এটাই যে, সে মুক্তিকামী। সম্ভবত একটা উপন্যাসেরও শেষ কথা। বিশ শতকে এভাবেই ঘরে ঘরে জন্মাচ্ছে সীতা, সাবিত্রীরা। যারা অনেকেই 'সোনার সীতা'। তারা নত হচ্ছে কিন্তু ধরা দিচ্ছে না। বিনত হওয়ার মধ্যে একটা প্রত্যাখ্যান আছে। বশ্যতা আর প্রেম এক

নয়। 'মানসী'র (১৯৮০) 'নারীর উক্তি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'মিছে তর্ক — থাক্ তবে থাক্,
কেন কাঁদি বুঝিতে পায় না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।।

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে
ওই তব আঁখি তুলে চাওয়া,
ওই কথা ওই হাসি, ওই কাছে আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে যাওয়া?।...

...আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষ - মানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয় — প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান।।'...

মধুসূদন যখন কোনোভাবেই কুমুকে আয়ত্ত করতে পারেনি তখন সে তার পায়ের কাছে বসেছে। নারীকে তুষ্ট করার জন্য পুরুষদের যে প্রচলিত পুনরাবর্তিত ক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেছেন। গীতগোবিন্দের ছন্দে পুরুষের এই ক্রীড়া যথেষ্ট নাটকীয় হতে পারে কিন্তু তাতে সে তার প্রণয়ীকে পায় না। যাকে পায় সে 'সোনার খাঁচায়' 'পোষ-মানা প্রাণ'। লক্ষ করব, দাম্পত্যের সংজ্ঞার্থে রবীন্দ্রনাথ বারবার খাঁচার ইমেজ ব্যবহার করেন। 'চোখের বালি'তে খাঁচার ভিতর মৃত পাখি ব্যঞ্জনাবাহী হয়ে ওঠে। 'যোগাযোগ' নাটকেও (২য় অঙ্গ, ২ দৃশ্য) দেখি শ্যামা মধুসূদনকে বলে— 'শূন্য খাঁচার দিকে বেড়ালের মতো তাকিয়ে আছ। লোকে বলবে কী?' খাঁচার ছবি এভাবে ঘুরে ঘুরে আসে। আর আসে জন্তুর চিত্রকল্প। কুমুর কখনো মধুসূদনকে মনে হয় লালায়িত জন্তু। ঠিক এই ছবিটাই পুরুষের দৃষ্টিতে পাই 'চতুরঙ্গ'—এ। নারীপুরুষের দাম্পত্যে যখন এরূপ অনুভূতি ছড়ায় তখন তা একটা যৌনগন্ধ বয়ে আনে, তার অতিরিক্ত কিছু দেয় না। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে 'সোনার সীতা'রা তাই ধরা দেয় কিন্তু তাদের প্রত্যেকের বিদ্রোহের ভাষা আলাদা। তারা প্রত্যেকে লড়াইয়ে জেতে না কিন্তু বিপ্লবের একটা প্রতিবেশ তৈরি হয়। হয়ত তারই ফলশ্রুতি ১৯৫৫-র নতুন বিবাহবিচ্ছেদ আইন।

আমাদের এই আলোচনার সূত্রে দুজনের নাম খুব অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে। প্রথমজন— হেমন্তবালা দেবী, দ্বিতীয়জন —আশালতা সিংহ। হেমন্তবালা দেবী সংসারবিচ্ছিন্না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নামে - বেনামে তার যে পত্রালাপ সেই সূত্রেই জানা যায় যে, —'যোগাযোগ' পড়ে হেমন্তবালা দেবীর কেমন লেগেছে তা জানতে রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ নিজেও হয়ত তার ভাবনার যাথার্থ্য কোথাও যাচাই করে নিতে চেয়েছেন। বুঝতে চেয়েছেন নারীর হৃদয়কে, নারীর মন দিয়েই। অন্যদিকে আশালতা সিংহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চোখের আলাপ না থাকলেও তিনি ছিলেন রবীন্দ্র স্নেহধন্যা। শ্বশুরবাড়ির আপত্তিতে আশালতার আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। আশলতা লিখেছেন— ...'রবীন্দ্রনাথ আমাকে অনেক চিঠি লিখেছেন, আমাকে দেখতে চেয়েছেন, এঁরা রাজি হননি।'

এই আশালতার 'দুই নারী' (১৯৩৫) উপন্যাস যেন 'যোগাযোগ' -এর দ্বিতীয় বিন্যাস। উপন্যাসের দুই নায়িকা সুজাতা এবং সুধীরা যেন কুমুদিনীর প্রশ্নবাহক। সুজাতা তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করে, হেরেও যায়। একসময় টের পায় যে সন্তানসম্ভবা। স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। ফিরে যাওয়ার আগে সে দার্জিলিং বেড়াতে যায় এবং সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যু তাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। অন্যদিকে নীরেনের প্রেমিকা সুধীরার বিয়ে হয় নীপেশের সঙ্গে বিয়ের দু'দিন পর (শুতে যাওয়ার আগে) সুধীরা বসে আনা কারেনিনা পড়ছিল। দীনেশ বলে —''ওই বই তুমি পড়, তা আমি চাইনে।'

'কেন?'

'বড় ইম্‌মরাল বই।'...

তাছাড়া পাশ্চাত্য চিন্তা, পাশ্চাত্য আইডিয়াজ্ ওসব মাথায় ঢুকিয়ে লাভটা কি: ও ত খাল কেটে বেনোজল ঢোকান বই নয়। আমাদের মেয়েদের শান্তি, নিষ্ঠা এ-সব বহুদিনের তপস্যার ফল। কাজ কি তাদের ঝোড়ো হাওয়ায় নষ্ট করে।" সুধীরা হঠাৎ উপলব্ধি করল— 'প্রত্যেক সীনের শেষে একবার করে এক্সলেন্ট পেতে হলে, নিজের কতখানি বিসর্জন দিতে হয়...।' তবু সুধীরা হাসে এবং শুতে যাওয়ার আগে সেই পেঁয়াজি রঙের শাড়িটা পরে, যেটা তার স্বামী খুব ভালোবাসে।

আশালতার এই উপন্যাস একটা প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। —তাহলে কোন পথটা মেয়েরা বেছে নেবে? মৃত্যুর পথ না 'এক্সলেন্ট' পাওয়ার পথ? নারীর অহংবোধ, যা প্রায় প্রতিমুহূর্তে বিসর্জিত তাকে ঘিরেই রবীন্দ্রনাথ

বা আশালতার প্রশ্ন। এই প্রশ্নটা বিশশতকে নতুন আমদানী। বিশ শতকের একদম শেষে লেখা উপন্যাস 'মৈত্রেয় জাতক' (১৯৯৬)-এও দেখি ইতিহাসের মূল্যায়ন করতে বসে এ যুগের সাহিত্যিক একটি সমাজ-রাজনীতিকে আবিষ্কার করেছেন। সুমনা তার মেয়ে বিশাখাকে বলে— 'ভাবছিলাম অম্বপালীর কথা। বহু ব্যক্তি তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন বলে সে গণিকা হল। আর এই উপ্পলবন্না হল শ্রমণা, একই কারণে।...মূলত দুজনের ভাগ্যই এক, একেবারে এক। ভেবে দেখো বিশাখা, নিরুপায় রমণী। এত রূপ-গুণ, কিন্তু পুরুষের ইচ্ছার অধীন। সমাজের নিয়মনীতি গুলো তো পুরুষেরাই গড়ে।' —এই শেষ বাক্যটি যতটা না সুমনার তার চেয়েও বেশি লেখকের। বিশেষত উনিশ শতক জুড়ে তার বর্ণমালা চোখে পড়ার মতো কিন্তু তা বুঝতে বুঝতে একটা শতক পেরিয়ে গেল। বিশশতকে যারা এ'বিষয়ে প্রশ্নমুখর হলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ আরো একটা বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছেন বা বলা ভলো প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন।— তা হল নারীর ভাষা। উনিশ শতকের দাম্পত্যের সংজ্ঞা যেমন বিশশতকে এসে ভেঙে যাচ্ছে তেমনই এই নতুন নারীর ভাষাকেও বুঝে নেওয়ার দায় বাড়ল পুরুষেরই। আসলে ভাষাটা না বুঝলে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে নায়িকারা হয় পতিপ্রাণা সতী নচেৎ তারা পুরুষের কর্মজগতের প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। সূর্যমুখী বা ভ্রমর কখনো কুমুদিনী হতে চায়নি। তাদের দুজনেরই একটা সতীত্বের গর্ব আছে। অন্যদিকে 'মৃণালিনী'তে মাধবাচার্য্যের কথায় বারবার মৃণালিনীকে ভুলে যাওয়ার নির্দেশ আসতে থাকে। হেমচন্দ্রের মহৎ ব্রতে মৃণালিনী যেন প্রতিবন্ধকতার মতো। আনন্দমঠ এও আমরা এই ধারণার সাক্ষ্য পাই। রবীন্দ্রনাথ বলবেন, এই দুই জগতের বিরোধ নেই। 'মৃণালিনী'র নতুন ভাষ্য নির্মিত হয় 'চার অধ্যায়' এ (১৯৩৪)। পুরুষকে আসলে নারীর ভাষা বুঝতে হবে। ভূপতি কখনো চারুর ভাষা বোঝে না। ভূপতি যে বুঝতে চায় না তা নয়, সে পারে না। তার কাজের জগতের চিন্তা তাকে ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। দাম্পত্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু যে প্রয়োজন, সেই বোধ এই পুরুষদের নেই। কুমুদিনী-মধুসূদনের মধ্যেও এই অভাবটাই বড় হয়ে উঠেছে। মধুসূদন কখনোই কুমুদিনীর শরীরী অনুভাবকে বুঝতে পারে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ততা তার স্বভাবেই নেই। কুমু তার কাছে— 'ভাবী মুনাফার একটা জীবন্ত বিধিদত্ত দলিল'। আবার লেখকই বলেন— 'হার মানাটা ওর ''পলিসিবিরুদ্ধ''। এই বাক্যে বা শব্দবন্ধ আমাদের মধুসূদনের কেজো স্বভাবকে চিনিয়ে দেয়। মনে পড়বে তাদের প্রথম দিনের কথা— নীলার আংটি খুলে নিতে চাইলে কুমু বলেছিল— 'না, থাক্।' মধুসূদন এর অর্থ বুঝেছিল উল্টো। 'সে মনে মনে হাসলে। আংটির উপর বিলক্ষণ লোভ দেখছি। এইখানে নিজের সঙ্গে কুমুর সাধর্মের পরিচয় পেয়ে একটু যেন আরাম লাগল।' লক্ষ্য করব, মধুসূদন ভাষাটা ধরতে পারে না। এরই পুনরাবৃত্তি দেখি বারবার। এসরাজের সঙ্গে মুক্তোর মালা পেয়ে কুমু কতটা খুশি মধুসূদন সেটা বোঝার চেষ্টা করে। এদিকে তার না বুঝতে পারা অন্যদিকে ব্যর্থ প্রভুত্বের অক্ষমতা—এই দুইয়ে মিলিয়ে তাদের দূরত্ব বাড়িয়েছে এবং কুমু নিজেকেও প্রয়োজনের সামগ্রী ভাবতে শুরু করেছে। তাই তার মনে হয় যে মধুসূদনকে ঠকাচ্ছে। দেবতার পায়ে কুমু তার মন - প্রাণ সমর্পণ করেছিল কিন্তু যে স্বামীকে সে পেল তাকে দেহদান বাধ্য হলেও মন সমর্পণ করতে পারেনি। অথচ দেহ এবং মনকে সে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। বাণী বসু'র 'মৈত্রেয় জাতক' -এ দেখি বিশাখা তার স্বামীকে দেহদানে বাধ্য হয় কিন্তু তার মনের নাগাল পাওয়া যায় না। '...স্নেহবচনের কোমলতায় আর্দ্র হয়ে প্রণয় বাসনায় বিহ্বল হয়ে পুণ্যবর্ধন পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন করল। তার উত্তরীয়ের বাতাসে প্রদীপ নিবে গেল।

—করুণা কর, করুণা কর হে তথাগত, এ তনুমনপ্রাণ সেই তাঁকে সমপর্ণ করেছি প্রভু। এই চিদাকাশে তিনি স্বর্ণপলাশের মতো জ্বলছেন। সেই পলাশের ছায়ায় সারাজীবন বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বসে থাকব, কিছু চাইব না, শুধু সেই প্রভা আমাকে ঘিরে তাকবে, তাহলেই সব পারব। যত কঠিনই হোক, যত উৎকট হোক সব সইতে পারব। সব।'

কুমুদিনীও যদি এমন কোনো উপায় খুঁজে নিতে পারত তাহলেও তার যন্ত্রণা কমত কিন্তু কায়মনবাক্যে সে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। শরীরী মিলনের সময় এই দেহ ও মনের বিচ্ছিন্নতার কথা আমরা বিশ শতকের সাহিত্যে বারবার পাই। এই বিযুক্তি কোথাও কখনো মনে হয় জন্তু অথবা মিলনের পরের সকালে তার নিজেকে মনে হয় অশুচি। সাঁইত্রিশ পরিচ্ছেদে মধুসূদন কুমুকে বিছানায় নির্দেশ দেয় এবং বলে 'এইখানে বসে রইলুম, যদি আমাকে ডাক তবেই যাব। 'কুমু অবশেষে অনেক কষ্টে বলে—'শুতে এসো'। ঔপন্যাসিক প্রশ্ন তুলেছেন— 'কিন্তু একেই কি বলে জিত?' মধুসূদনের বাহুবন্ধনে কুমু হাঁপিয়ে ওঠে কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় না। মধুসূদন বোঝে সে কুমুকে পাচ্ছে না, দুজনের মাঝে এই আড়ালটা সরে যায় বলেই বিষয়টা আরো কুশ্রী হয়ে ওঠে।

মধুসূদনের কাছে ঐহিক প্রয়োজন ছাড়া কুমুর কোনো মূল্য নেই। বস্তুত কাহিনীর প্রতিবাদ এখানেই। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'র বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অ-প্রয়োজনের রসের জগতের কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, এখানেই জীবনের আনন্দ। 'আষাঢ়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'মানুষের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ঐ ভাষাতে মানুষের প্রকাশ; সেইজন্য উহার মধ্যে এত রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিতে না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত, সুর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থপিন্ডের চারি দিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ুমণ্ডল

আছে। তাহারা যেইটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি, তাহাদের ইশারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়। ইহাদের পরিচয় তদ্ধিত প্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে।' মধুসূদন- কুমুদিনীর দাম্পত্যে কোনোদিনই চিত্তপ্রত্যয়ের বিনিময় হয়নি। আকাশের অবকাশ সেখানে নেই। 'মানসী'র 'বধু ' কবিতায় যে কিশোরীটি পাতালে চায়, নিজের জগৎকে খুঁজতে চায়, কুমু যেন তারই মতো।

'যোগাযোগ' নাটক বাউলের গলায় একটি গান আছে যা বিষয়টির ভাবকেই ত্বরান্বিত করে। নেপথ্যে বাউল গায়—

'লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই?
দেখ্ রে চেয়ে আপন - পানে, পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই।'...

এই গানে একটা অপ্রস্তুত ভাব আছে। সেই ভাবটা যেন এই সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। কুমুদের তাই আর ফুটে ওঠা হয় না—

'হল না তার ফুটে ওঠা, কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা—
মর্ত্য - কাছে স্বর্গ যা চায় সেই মাধুরী কোথা রে পাই।।'

এই খোঁজটা বিশ শতকীয়। একদিকে এই খোঁজ চলে, অন্যদিকে চলে অহংবোধের উন্মোচন। নারী যখন তার প্রয়োজনের অতিরিক্ততায় নিজেকে আবিষ্কার তখনই এই উন্মোচন সম্ভব। সামান্য ঘরকন্নার গন্ডি পেরিয়ে সে তখন তার নিজস্বতায় ফুটে ওঠে। এমনি করে এক দিকে অন্তরের, যে একদিকে কাজের সে আর এক দিকে সমস্ত আবশ্যকের বাহিরে, যাহাকে একদিকে স্পর্শ করিতেছি সে আর এক দিকে সমস্ত আয়ত্তের অতীত—যে একদিকে সকালের সঙ্গে বেশ খাপখাইয়া গিয়োছে সে আর এক দিকে ভয়ংকর খাপছাড়া, আপনাতে আপনি।'[৫]

মধুসূদন এই অকারণ আনন্দের অবকাশ যেমন খুঁজে পায়নি তেমনি ছুঁতে পারেনি কুমুকেও। কুমু তার কাছে 'বড়োবউ' হয়েই রয়ে গেল। সমগ্র উপন্যাসে যে অন্তর্বুনন তা যেন প্রচলিত দাম্পত্যের প্রতিকৃতি। মেয়েরা সেখানে 'বড়োবউ' বা 'মোতির মা' হয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়। কুমু সেক্ষেত্রে ভাগ্যবান, অন্তত সে নিজের জন্য ভাবতে পেরেছে। অবিনাশ ঘোষালের জন্মের পর নূরনগরের কুমু তার দাদার কাছে আবার ফিরেছিল কিনা সে প্রশ্ন তোলা থাক। অন্তত ঔপন্যাসিক সে পথে খোলা রেখেছেন। বরঞ্চ আমরা বুঝে নেব সেই কুমুকেই — যে 'কার্বলিক অ্যাসিড' খেয়ে আত্মহত্যা করে না। মধুপুরীর অন্ধকার ঘর পেরিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করে 'কুমু' বলেই।

গ্রন্থ সূত্র :

১। সুতপা ভট্টাচদার্য, বিবাহ-প্রতিষ্ঠান : রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ, সে নহি নহি, সুবর্ণরেখা বৈশাক ১৮১১।
২। গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী পৃ. ৩০৯, প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০৭।
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবাহ।
৪। গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী পৃ. ৩০৯, প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৪০৭।
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাগল, বিচিত্র প্রকল্প, চতুর্দ্দশ খণ্ড প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ ৭৫৬, প্রকাশ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮।